ব্যাকরণ বিচিত্রা

আবদুল নইম

ব্যাকরণকে এক কথায় বলা যেতে পারে ভাষা-সংবিধান। ব্যবহারিক প্রয়োজনে সংবিধানের যেমন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। ভাষা ব্যাকরণের দাসত্ব করে না, ব্যাকরণই ভাষার পিছনে পিছনে তার প্রয়োজনীয় এবং পরিবর্তিত গতিপথের দিকে লক্ষ্য রেখে রেখে নিজস্ব নিয়মকানুন গুলিকে সময়-উপযোগী সংশোধন করে নেয়। যে ভাষা ব্যাকরণের বিশেষ গণ্ডীতে আবদ্ধ সে ভাষার সচলতা সম্ভব নয়। সংস্কৃত ভাষা আজ তাই মৃত। সেখানে ব্যাকরণই ভাষার প্রয়োজনীয় গতিপথ নির্দেশ করে দিয়েছে। ব্যাকরণের চারটি উঁচু পাড়ে আবদ্ধ সংস্কৃত ভাষা তাই স্রোতোহীন, নিশ্চল। অন্যদিকে বাংলা ভাষা তার সজীবত্ব আজও সমানভাবে বজায় রেখে চলেছে। কারণ, ব্যাকরণের বিশেষ গণ্ডীতে সে নিজেকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করে রাখে নি। ভাষাস্রোত নিত্যনিয়ত গতি-পথ প্রয়োজনে বদলে বদলে চলেছে। ব্যাকরণ চলবে তারই অনুসারী হয়ে।

ভাষার উপযোগী সম্পূর্ণ ব্যাকরণ আজও আমাদের তৈরী হয়নি। হওয়াও সম্ভব বা সঙ্গত বলে মনে করি না। কেননা ভাষা পরিবর্তিত হয়ে চলে নানা ভাবে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে। ব্যাকরণ এই বাহ্যিক পরিবর্তনের ব্যবহারিক গতিকে একটা নিয়মে বাঁধতে চেষ্টা করে মাত্র।

বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছিল বিদেশীদের দ্বারা আজ থেকে প্রায় দু'শো চব্বিশ বছর আগে। এরপর বাঙালী পণ্ডিতরা বিভিন্ন সময়ে ব্যাকরণ রচনায় হাত দিয়েছেন সেই রাজা রামমোহন রায়ের আমল থেকে। বাংলা ব্যাকরণ আজ অনেকখানি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচিত—একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবু ব্যাকরণে যাঁদের বিশেষ কৌতূহল আছে, ব্যাকরণ যাঁদের পঠন-পাঠনের বিষয়, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে কিছু কিছু

আলোচনার অসম্পূর্ণতা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। কিছু কিছু সময়-উপযোগী সমস্যা আমাদের মনকে নোতুন করে ব্যাকরণবিচারে উদ্বুদ্ধ করায়। কিছু কিছু সময়-উপযোগী সংশোধন আবশ্যক বলে আমাদের মন মাথা নেড়ে উঠে। ব্যাকরণ পঠন-পাঠনের সময় এমনি কতকগুলি আলোচনার অসম্পূর্ণতা, কতকগুলি নোতুন সমস্যা ও সময়-উপযোগী কিছু কিছু সংশোধনের কথা আমার মনে উঠেছিল। সে-গুলিই এখন এক এক করে আলোচনা করছি। এদিকে ব্যাকরণবিদ চিন্তাশীল ভাষা-প্রেমিক সুধী সমাজের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রথমেই ধরা যাক—ক্রিয়ার কাল প্রসঙ্গ। কালের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডঃ সুনীতিকুমার বলেছেন, "প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগে যে রূপান্তর ঘটিলে, ক্রিয়া ব্যাপারটি সাধারণতঃ 'ঘটিতে থাকে' বা 'এখনও ঘটিতেছে' বা 'অতীতে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে' অথবা 'ভবিষ্যতে ঘটিবে' এই প্রকার কালের বোধ হয়, তাহাকে বলে ক্রিয়ার কালরূপ (Tense)।" সংজ্ঞা এবং সাধারণ স্বীকৃতি অনুসারে বাংলা ব্যাকরণে কাল তিনটি: বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। এই তিনটির আবার প্রত্যেকটির চারটি করে ভাগ। অর্থাৎ সর্বমোট বাংলায় কাল বারটি বলে সাধারণ ভাবে স্বীকার করা হয়ে থাকে। —কর ধাতুর ক্রিয়ারূপ অনুসারে এই বারটি কাল হচ্ছে,

বর্তমান **:** ১। সাধারণ বর্তমান—আমি করি
২। ঘটমান বর্তমান—আমি করিতেছি
৩। পুরাঘটিত বা সম্পন্ন বর্তমান—আমি করিয়াছি
৪। বর্তমান অনুজ্ঞা—তুমি কর, সে করুক

অতীত **:** ১। সাধারণ অতীত—আমি করিলাম
২। ঘটমান অতীত—আমি করিতেছিলাম
৩। পুরাঘটিত অতীত—আমি করিয়াছিলাম
৪। নিত্যবৃত্ত অতীত—আমি করিতাম

ভবিষ্যৎ **:** ১। সাধারণ ভবিষ্যৎ—আমি করিব
২। ঘটমান ভবিষ্যৎ—আমি করিতে থাকিব
৩। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—আমি করিয়া থাকিব
৪। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—তুমি করিও

এই বারটি কালের মধ্যে দু'টিকে প্রথম চোটেই বাদ দেওয়া যেতে পারে। এ দু'টি হচ্ছে অনুজ্ঞার অন্তর্গত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের তথা-কথিত দু'টি কালরূপ।

অনুজ্ঞা আসলে ক্রিয়ার কোন কালরূপ নয়। প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগে ক্রিয়াকরণের কাল বা সময়ের কোন পরিবর্তন এতে সূচিত হয় না। অনুজ্ঞা আসলে ক্রিয়ার ভাব-বিশেষ। ইংরেজীতে যাকে Mood বলা হয়ে থাকে। বক্তার উদ্দিষ্ট আবেদন, আদেশ, অনুমতি, অনুরোধ আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, অভিশাপ, শুভানুধ্যান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব অর্থেই অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়ে থাকে। অনুজ্ঞার বিভক্তি বা প্রত্যয়গত বিশিষ্ট কোন রূপ নেই। তবে প্রয়োগ সাধারণতঃ বর্তমান রূপেই হয়ে থাকে। আমাদের অনুজ্ঞা ইংরেজীর শুধু Imperative Moodই নয় Optative Sentence এর রূপও। এইজন্য অনুজ্ঞাকে বাংলার বিশিষ্ট কালরূপ হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

দু'টি অনুজ্ঞা বাদ দিলে বারটি কালের মধ্যে বাকী থাকে দশটি। এই দশটির মধ্যে আরও একটিকে জোর করে পাকড়াও করা যেতে পারে আসামী হিসাবে। সেটি পুরাঘটিত বা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ কাল। ভবিষ্যতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "বাক্যস্থিত সমাপিক ক্রিয়াপদের রূপে যদি এইরূপ বোধ হয় যে, উদ্দিষ্ট ক্রিয়া ব্যাপারটি এখনও ঘটে নাই, ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহা হইলে, সেই ক্রিয়ার কালরূপকে বলে ভবিষ্যৎ কালরূপ (Future tense)।" (সুনীতিকুমার) অর্থাৎ যে কাজ এখন হচ্ছে না, আগে হয়নি, কিছু পরে হবে সেই কাজের সময়কে বলে ভবিষ্যৎ কাল।

এখন পুরাঘটিত ভবিষ্যৎকাল রূপটিকে ভেঙে বিচার করে দেখা যাক। এই কালটির বিশিষ্ট চিহ্ন—ইয়া (পুরাঘটিতের) + ইব (ভবিষ্যতের)। যেমন: আমি কাজটি করিয়া থাকিব। তুমি বইটি পড়িয়া থাকিবে। সে সেখানে গিয়া থাকিবে।

'পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ' এই কালরূপটিকে ভেঙে বিচার করতে গেলেই দেখা যাবে এর নামকরণই অসঙ্গতিপূর্ণ। পুরা অর্থ সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ ঘটিত অর্থাৎ যা ঘটে গেছে অর্থাৎ পুরাঘটিত বলতে বোঝায় যে ক্রিয়া ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে বা ঘটে গেছে। ঘটে গেছে নিশ্চয়ই কিছু সময় পূর্বে। (পুরাঘটিত অতীত ও বর্তমান কালরূপের দিকে তাকালেই এর মর্ম উপলব্ধি করা যাবে।) আর ভবিষ্যৎ অর্থাৎ যা

পরে ঘটবে, এখনো ঘটেনি, বা এর আগেও ঘটে যায়নি। যে কাজ ইতিপূর্বেই সম্পূর্ণরূপে ঘটে গেছে সে কাজ একই সঙ্গে পরে ঘটবে (পুরাঘটিত ভবিষ্যতের যা মূল অর্থ) সে কথা কিছুতেই হতে পারে না। আকাশকুসুম বরং কল্পনা করা যেতে পারে কিন্তু পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল কল্পনা করা যায় না বলেই মনে হয়।

কাল বিচারে লক্ষ্য রাখতে হবে দু'টি দিকে : রূপ এবং অর্থ। কোন বিশেষ একটির দিকে গুরুত্ব দিলেই হবে না। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎকাল রূপটিতে প্রধানতঃ রূপের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে অর্থের দিকে মুখ ফিরিয়ে। 'করিয়া থাকিব' এই রূপের 'ইয়া-ইব' বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে ভবিষ্যৎ কালেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে বিচার করলে কি হয় এবার দেখা যাক। আমি কাজটি করিয়া থাকিব। তুমি বইটি পড়িয়া থাকিবে। এখানে 'করিয়া থাকিব' এর অর্থ 'পরে করিব'—তা কিছুতেই হতে পারে না। অথচ ভবিষ্যৎ কাল রূপের এটিই বিশিষ্ট লক্ষণ। 'করিয়া থাকিব' কথাটির মধ্যে একটা সন্দেহের ভাব বর্তমান। অর্থাৎ কাজটি আমি করে থাকতে পারি কিন্তু করেছি কিনা স্মরণ নেই। ধরে নেওয়া গেল কাজটি করা হয়েছে। কিন্তু হয়েছে কখন? নিশ্চয়ই এখন নয়। অনেক আগে অর্থাৎ অতীতে।

সুতরাং 'করিয়া থাকিব' বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে ভবিষ্যৎ পর্যায়ের বটে, কিন্তু কালের দিক দিয়ে অতীতের এবং তাও সন্দেহের কালিমাযুক্ত। ঠিক তেমনি—তুমি বইটি পড়িয়া থাকিবে। এখানে পড়েছ কিনা ঠিক স্মরণ নেই। সন্দেহ আছে। তা ছাড়া পড়ে থাকলেও সে আজ নয়, অনেক আগে অর্থাৎ অতীতে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে 'পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ' নামধেয় কালরূপের দৃষ্টান্তে যা বোঝাচ্ছে তা কালের দিক দিয়ে অতীতের এবং সন্দেহের কালিমাযুক্ত—কেবলমাত্র বাহ্যিক রূপের দিক দিয়েই ভবিষ্যতের অন্তর্ভুক্ত। আসলে এভাবে কালবিচার চলে না। এজন্য ভবিষ্যৎ রূপ থেকে এই কালটিকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে হয়। আর তাহলে বাংলায় কালের সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বমোট ন'টি।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ নামধেয় এই কালটির যথার্থ বিচারে যদি নোতুন নামকরণের আদৌ প্রয়োজন হয় তাহলে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী-প্রদত্ত 'সন্দিগ্ধ অতীত' নামকরণটিকেই সুপ্রযুক্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা এ কথা কিছুতেই

অস্বীকার করা যাবে না যে কালটি স্বরূপতই অতীতের এবং এই কালরূপের মধ্যেই একটি সন্দেহ সম্পূর্ণ বর্তমান। 'সন্দেহাত্মক অতীত' নামকরণের চেয়ে 'সন্দিগ্ধ অতীত, নামটিই সুন্দর।

বাদ বাকী ন'টি কাল সম্পর্কে আপত্তির কিছু নেই। এগুলি রূপ এবং অর্থ দুই দিক দিয়েই সুপ্রযুক্ত।

সুতরাং বাংলায় প্রকৃতপক্ষে রূপ এবং অর্থসঙ্গতি বিচারে ক্রিয়ার কাল ন'টি একথাই স্বীকার করতে হয়। কেউ কেউ অনুজ্ঞাকে (যাকে আমরা ক্রিয়ার ভাব বা Mood বলারই পক্ষপাতী) 'কাল বিভাগের বাহিরে স্বতন্ত্ররূপে দেখিবার প্রয়োজন অনুভব' করেন না। কিন্তু ক্রিয়ার ভাব বা Moodএর পৃথক আলোচনা হওয়াই সঙ্গত বলে আমরা মনে করি।

অনুজ্ঞাকে আমরা প্রত্যয় বিভক্তিযুক্ত কোন বিশিষ্ট কালরূপের মধ্যে নিঃসন্দেহে ফেলতে পারছিনা, সেটা আমরা দেখেছি। এটি ক্রিয়ার ভাব বিশেষ। একথা অবশ্যস্বীকার্য। শুধু তাই নয় —যদি সে আসে তাহলে আমি যাব—এখানে একই বাক্যের অন্তর্গত এই রূপটিকে কোন কালের বলে ধরা যাবে? রূপের দিক দিয়ে 'যদি সে আসে' এই অংশটি বর্তমান কালেরই অন্তর্গত, কিন্তু একটি সংশয় বা অনির্দেশক ভাবই এখানে বড়ো হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় অংশের 'তাহলে আমি যাব' রূপের দিক দিয়ে ভবিষ্যতেরই পর্যায়ভুক্ত কিন্তু তাহলে একটি শর্ত আরোপের গুরুত্ব বড়ো হয়ে উঠছে। অর্থাৎ এখানে এই বাক্যটিতে একটা সন্দেহ বা সংশয়, একটা শর্ত, ও দু'টি অংশের মধ্যে সাপেক্ষ সংযোজক ভাব বর্তমান। এটিকে তাই সংযোজক, অনির্দেশক বা সংশয়ভাবের বলে উল্লেখ করা যায়। ইংরেজীতে Subjunctive Moodএ এই রকম ভাবই প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে ক্রিয়ার ভাব—প্রথম বাঙালী বৈয়াকরণ রাজা রামমোহন রায় যাকে 'ক্রিয়ার প্রকার' বলেছেন তাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না বা করাও উচিত হবে না। তবে 'ক্রিয়ার প্রকার' শব্দরূপটি ব্যবহারে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। ক্রিয়ার প্রকার বলতে সাধারণতঃ সমাপিকা অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্মক-অকর্মক ক্রিয়া প্রভৃতি বুঝিয়ে থাকে। তাই আমরা 'ক্রিয়ার ভাব' বলারই পক্ষপাতী।

প্রত্যয় ও বিভক্তিযোগে ক্রিয়ার কালরূপ গঠিত হয়। কিন্তু বাংলায় এমন অনেক ক্রিয়ারূপের ব্যবহার দেখা যায় যেখানে রূপের দিক দিয়ে বর্তমান কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে ভবিষ্যৎকালই সূচিত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত দেখা যাক: (১) আমি কাল বাড়ী যাচ্ছি; (২) দিন দশেক বাদে আসছে; (৩) বসুন, একটু পাশের ঘর থেকে আসছি। দৃষ্টান্ত তিনটি বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে অসম্পন্ন বা ঘটমান বর্তমান কালরূপেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আসলে উদ্দিষ্ট কি বর্তমান? ঘটনাগুলি কি ঘটমান বা চলছে এমন পর্যায়ের? সাধারণ বিচারে এগুলির মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎকালের রূপই ফুটে উঠেছে। 'আমি কাল বাড়ী যাচ্ছি' অর্থাৎ যাওয়া ক্রিয়াটি আমার দ্বারা বর্তমানে সম্পন্ন হচ্ছে না। আমি বাড়ী এখন যাচ্ছি না কিন্তু কাল যাব। অর্থের দিক দিয়ে এটি তাই ভবিষ্যৎ কালরূপেরই অন্তর্গত।

দিনদশেক বাদে সে আসছে=দিনদশেক বাদে সে আসবে। ঠিক তেমনি: বসুন, একটু পাশের ঘর থেকে আসছি=পাশের ঘরে যাব, সেখানে কোন কাজ সারব, তারপর ফিরব। এগুলি তাই অর্থের দিক দিয়ে ভবিষ্যৎকালেরই অন্তর্গত।

সুতরাং কালবাচক বিশিষ্ট প্রত্যয় বা বিভক্তি দিয়ে এদের কোন স্বরূপলক্ষণ ফুটে উঠছে না। ফুটে উঠছে ব্যবহার বিশেষের মধ্য দিয়ে। তাই অর্থের দিক দিয়ে আভ্যন্তরসঙ্গতি সম্পন্ন হলেও বাহ্যিক বিচারে রূপের দিক দিয়ে কিছুটা বিভ্রম-উৎপাদী, একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। যদিও এই রকম ব্যবহারই আমরা নিত্যনিয়ত করে থাকি। প্রশ্ন ওঠে, ব্যাকরণে একে কিভাবে গ্রহণ করা যাবে? রূপবিচার বাদ দিয়ে তবে কি কেবলমাত্র অর্থসঙ্গতির দিকেই মূল লক্ষ্য রাখা হবে? দৃষ্টান্তগুলি কোন কালের?—এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই করা যেতে পারে। বিজ্ঞান-সম্মত জবাব অবশ্যই দেওয়া চলে—বর্তমানসমীপ ভবিষ্যৎ।

এই বর্তমানসমীপ ভবিষ্যৎ কালরূপের ব্যবহার পাণিনিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় প্রয়োগকে তিনি বলেছেন, 'বর্ত্তমান সামীপ্যে বর্ত্তমানবৎ বা'। আর এই বর্তমান সামীপ্যে অর্থে 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' বলেছেন, 'বর্ত্তমানসমীপে ভূতে ভবিষ্যতি চ'।

আরও বহু বিচিত্র ধরণের কালরূপের ব্যবহার বাংলায় লক্ষ্য করা যায়। 'আল্লা যদি সুযোগ দিতেন, হজে যেতাম'—এখানে রূপের দিক দিয়ে অতীতের কিন্তু অর্থতাৎপর্য ভবিষ্যতের। অর্থাৎ আল্লা যদি সুযোগ দেন (=দেবেন)

(তাহলে) হজে যাব।—এখানে উদ্দিষ্টকাল ভবিষ্যৎ, প্রয়োগ অতীতের মত।

আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থে অতীতবৎ ভবিষ্যতের ব্যবহার বৈয়াকরণ পাণিনি অনুমোদন করেছেন। 'আশংসায়াং ভূতবৎ'-এর ব্যাখ্যায় 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' বলেছেন, 'ভবিষ্যতিকালে ভূতবৎ'। ইংরেজীতে Subjunctive Mood-এর ক্ষেত্রে এইরকম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। Nesfield থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

'Had he met me, he would have known me'-এর বিশ্লেষণে Nesfield এর মন্তব্য : 'Past tense, because it is past in form. But in the Subjunctive mood the past form has reference not to past, but to present or future contingencies. সে যাই-ই হোক, এই ধরণের নানা সমস্যা আমাদের সামনে হাজির হয় এটাই বিশেষ বক্তব্য।

আরও কিছু কিছু জটিল রূপের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর 'সরল বাঙলা ব্যাকরণ'-এ। দুই একটা দেখা যাক। 'কেষ্ট রইল, একটু দেখবেন' —এখানে কেষ্ট বর্তমান সশরীরে—থাকবেও ভবিষ্যতে—অথচ মনে হচ্ছে সে যেন অতীতের বস্তু হতে চলেছে।

'কখন এলে? এই এলাম'—ক্রিয়ারূপ অতীতের কিন্তু ব্যবহার পুরাঘটিত বর্তমানের মত। কখন এলে?=কখন এসেছ; এই এলাম=এই (মাত্র) এসেছি।

'আমি না হয় গেলাম, কিন্তু ফল হবে?' এখানে প্রথম অংশে—অতীত দ্যোতনা; দ্বিতীয় অংশে ভবিষ্যতের ভাব। আদতে এখনো যাওয়াই হয়নি, হলে পরে হবে, কিন্তু যাওয়া যেন নিশ্চিতভাবে হয়েই গেছে, ধরে নিয়ে তার ফল চিন্তা।

বাংলা ক্রিয়ার কালের আরও এমনি নানা প্রসঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের বিচার্য, বাংলায় কালরূপ নির্ধারণের নিয়ামক কি? যেখানে রূপ এবং অর্থের সঙ্গতি বর্তমান সেখানে তো সর্বাঙ্গ সুন্দর। কিন্তু যেখানে বাহ্যিক রূপ এক ধরণের, উদ্দিষ্ট বক্তব্য অন্যধরণের, যেখানে ব্যবহারিক কথাবার্তায় বলতে বুঝতে অসুবিধা হয় না, সেখানে ব্যাকরণ-বিচারে কোনপথ অবলম্বন করা যেতে পারে?

এই ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলা ভাষার সংবিধান বা বাংলা ব্যাকরণের কি সংশোধনের প্রয়োজনীতা নেই? শিক্ষার্থীদের কাছে কি বাহ্যিক

ব্যবহার ও ব্যাকরণবিচার দুটির মধ্যকার অসঙ্গতি চরম বিভীষিকা হয়ে দেখা দেবে না? একে তো ব্যাকরণ স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ ছাত্রদের কাছে বিভীষিকা-স্বরূপ। উপায় নেই বলেই দাঁত মুখ খিচিয়ে মুখস্থ করতে বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে একটু বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলেই মনে করি। ১॥

এর পরের আলোচনায় আনা যেতে পারে লিঙ্গ প্রকরণকে। এ সম্পর্কিত আরবী উর্দু বা সংস্কৃতের বিশেষ নিয়ম বাংলায় খাটে না। সংস্কৃতে লিঙ্গ নিরূপণ সব সময় অর্থনির্ভর নয়, অনেক সময় ভাষার প্রয়োগনির্ভর। একই 'পত্নী' অর্থে 'দার' শব্দ পুংলিঙ্গ, 'ভার্যা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'কলত্র' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। বাংলাতে এইভাবে লিঙ্গের স্বরূপ নির্ধারণ সম্ভব নয়, আমাদের কাছে পত্নী, দার, ভার্যা, কলত্র সবই স্ত্রীলিঙ্গ।

বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে থাকে অর্থ ও স্বরূপ উভয় দিকে লক্ষ্য রেখেই। আর এই ভাবেই বাংলায় লিঙ্গ বিভাগ করা হয়েছে চার রকমে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গ। এই চারটির মধ্যে উভয়লিঙ্গ নির্ধারিত হয় প্রধানতঃ ভাষায় প্রয়োগ অনুসারে। স্ত্রীলিঙ্গার্থক 'গাই' শব্দের বিপরীতার্থক পুংলিঙ্গ-বাচক শব্দ হিসাবে 'গরু'র ব্যবহার অসিদ্ধ নয়। কিন্তু যখন বলি 'গরুটা গাড়ী টানতে পারছে না, তখন সেখানে গরু অর্থে বলদ-গরুকেই বুঝি। আবার যখন বলি 'গরুটা দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে' তখন যে সেখানে গরু অর্থে গাইগরুই আমাদের উদ্দিষ্ট সে সম্পর্কে কারো কোন সংশয় থাকে না। ভাষায় এমনি ব্যবহার ছাড়াও পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক বিশেষ শব্দের যোগে—বলদ গরু ও গাইগরুর ব্যবহার ব্যাকরণে-বাক্যে বিশেষ ভাবে চলিত আছে। উভয়লিঙ্গক শব্দরূপে অধিকাংশ সময়ই স্ত্রী ও পুরুষ জাতি পৃথক ভাবে বোঝাবার জন্য পৃথক পৃথক শব্দের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। ওপরের দৃষ্টান্তে বলদ ও গাই যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক বিশেষ শব্দরূপ। ঠিক তেমনি উভয়-লিঙ্গক 'বাছুর' শব্দটির পুংলিঙ্গে 'এঁড়ে বাছুর' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'বকনা বাছুর'।

বাংলায় প্রচলিত পুংলিঙ্গার্থক কয়েকটি শব্দ ইতিমধ্যেই উভয়লিঙ্গক রূপ গ্রহণ করেছে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—ছেলে, কবি, শিল্পী। 'ছেলে' শব্দটি স্বরূপতই

পুংলিঙ্গ-বাচক ; এর স্ত্রীলিঙ্গবাচকরূপ 'মেয়ে'। এই অর্থেই শব্দ দু'টি এখনো বহুল-ব্যবহৃত। তবু 'ছেলে' শব্দটি ইতিমধ্যেই উভয়লিঙ্গক শব্দ-রূপে প্রমোশন পেয়েছে। পুংলিঙ্গে পুরুষবাচক 'বেটা' ও স্ত্রীলিঙ্গে স্ত্রীবাচক 'মেয়ে' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এদের যথাক্রমিক রূপ দাঁড়িয়েছে 'বেটাছেলে' ও 'মেয়েছেলে', এতে যদিও উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরই লিঙ্গান্তর ঘটেনি। 'কবি' ও 'শিল্পী' শব্দ দু'টি সম্পর্কেও প্রায় একই কথা। অবশ্য এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে শব্দ দু'টি যাঁদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত, এতকাল তাঁরা ছিলেন প্রধানতঃ পুরুষ-জাতীয়। এখন নারীরাও তাঁদের নিজস্ব স্থান করে নিয়েছেন।

আরও কতকগুলি শব্দের ব্যবহার অনুযায়ী লিঙ্গ-রূপ নির্ণয়ে সচেতনতার দরকার হয়ে পড়েছে। এমনি কয়েকটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমেই ধরা যাক 'ভাই' শব্দটিকে। শব্দটি পুংলিঙ্গবাচক, স্ত্রীলিঙ্গে 'ভাবী' ও 'বোন' দুই-ই হতে পারে। 'ভাই'-এর স্ত্রীলিঙ্গ প্রতিশব্দ হিসাবে 'ভাবী, ভাজ' (ভ্রাতৃজায়া) সার্থক। কিন্তু 'ভাইবোন' শব্দে 'বোন' বিপরীতার্থক শব্দই।

'ভাই' শব্দটি এখন বিভিন্ন মহলে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাষা-সংবিধানে এটি পুংলিঙ্গবাচক। কিছু ব্যবহার দেখা যাক। অভীষ্ট-লাভে ব্যর্থ-মনোরথ গিন্নির কড়া-কটু কথার জবাবে কর্তা যখন বলেন—'যাকগে ভাই। অন্যায় হয়ে গেছে। মাফ করে দাও।' কিম্বা মেয়েরা যখন পারস্পরিক আলোচনায় একে অপরকে 'ভাই' সম্বোধন করে বলেন 'তুমি কিন্তু ভাই এসো আমাদের বাড়ী' কিম্বা 'তোমার কথাটা ভাই একেবারে ভুলে গেছি, তুমি কিছু মনে করো না ভাই'। তখন 'ভাই' শব্দটির ব্যবহার হচ্ছে বিভিন্নভাবে। মূল পুরুষ-বাচক 'ভাই' শব্দটির ব্যবহারে ব্যবহার-কারিনীদের কিন্তু লিঙ্গান্তর সূচিত হচ্ছে না। তাছাড়া এই 'ভাই' সম্বোধনটি মেয়েদের মধ্যে একান্ত স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে পূর্বে আলোচিত উভয়-লিঙ্গক শব্দগুলির ন্যায় এখানে স্ত্রী বা পুরুষবাচক কোন প্রতিশব্দ আদিতে ব্যবহৃত হচ্ছে না। অথচ ব্যবহার-বিধি অনুযায়ী এটিকে উভয়লিঙ্গক বলা ছাড়া উপায় কি ?

'লক্ষ্মী' শব্দটি আদতে স্ত্রীলিঙ্গ। মেয়েদের আমরা স্বাভাবিক ভাবেই বলে থাকি 'লক্ষ্মী' মেয়ে। এখানে এ সম্পর্কে কোন কথা ওঠে না। কথা ওঠে যখন আমরা

কাউকে কোন কিছু করতে দিয়ে বা নিষেধ করে আদর করে বলি 'লক্ষ্মী ভাই আমার, এ কাজটি করো না'। কিম্বা 'তোমার মতো লক্ষ্মী ছেলে আর হয় না। লক্ষী ভাই আমার, কাজটা চট্ করে সেরে এসো।'—এ রকম ব্যবহার এখন আমাদের কাছে একান্ত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মেয়েও আমাদের কাছে লক্ষ্মী, ছেলেও আমাদের কাছে লক্ষ্মী। ব্যবহার-অনুযায়ী তাই লক্ষ্মী শব্দের লিঙ্গ নিরূপণ হওয়া উচিত হয় কি ?

'সুন্দর'-এর স্ত্রীলিঙ্গবাচক প্রতিশব্দ 'সুন্দরী'। মেয়েদের বিশেষণ হিসাবে এটিই বহুকালের ব্যবহৃত শব্দ। কিন্তু আজকাল আমরা সুন্দরী পর্যন্ত যেতে ইচ্ছা করি না। 'মেয়েটা খুব সুন্দর দেখতে' এই পর্যন্ত বলেই ছেড়ে দিই। এতে আমাদের উদ্দিষ্ট বলতে বা বুঝতে কোন পক্ষেই অসুবিধা হয় না। ২ ॥

বাংলা ব্যাকরণ রচনা প্রসঙ্গে প্রথম দিকের অভিযোগ ছিল বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণেরই ইতঃস্তত রংরিপুমাত্র। ইদানীং কালের অভিযোগ—ইংরেজী ব্যাকরণের ছাঁচে ঢালা। অভিযোগের পিছনে যে কিছু না কিছু সত্য বর্তমান সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছুমাত্র সুযোগ নেই বলেই মনে হয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, বাংলা ভাষা যেমন ইংরেজী ভাষা নয়, ঠিক তেমনি সংস্কৃত ভাষাও নয়। বাংলা ভাষা বাংলা ভাষাই—আর অন্য কিছু নয়। ব্যাকরণগত বা বাগ্-বিধির ব্যবহারগত মিল থাকা একই বংশ-উদ্ভূত ভাষাগুলির মধ্যে অসম্ভব মোটেই নয়। কিন্তু তার জন্যে একটাকে আর একটার অবিকল অনুকরণে গড়ে তুলতে যাওয়া বা আলোচনা করতে চাওয়া পণ্ডিত-বুদ্ধির কাজ হতে পারে সুবুদ্ধির কাজ হয়তো সবসময় নয়। সেই জন্য কোন বিশেষ ভাষার স্বরূপ বিচারে সেই ভাষার স্বকীয় বিশেষ রূপটিকে অবহেলা করে অন্য কিছুর প্রাধান্য দেওয়া অস্বাভাবিক, অসঙ্গত এবং সময় বিশেষে হাস্যোদ্রেককর ছাড়া আর কিছুই হয় না।

বাংলা কারক-বিভক্তি প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে এই ধরণের কিছুটা মতা-মতের সম্মুখীন হতে হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, এই রকম ধরণের কথা যাঁরা বলেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে সবিশেষ মতামত দেওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তিনজন বরেণ্য ভাষাবিদকে টেনে আনব। এঁরা হলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ সুকুমার সেন।

প্রথমে কারক-বিভক্তির সাধারণ আলোচনায় আসা যাক। পরে এ সম্পর্কে এই সমস্ত বিশেষজ্ঞদের মতামতে আসব।

কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন সাধিত শব্দ—ক্রিয়া ও কারক ব্যাকরণে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তাই যাতে কোন কিছু করা বুঝায় না তা কিছুতেই ক্রিয়া নয় এবং ক্রিয়ার সঙ্গে যা অন্বিত নয় তা কারকও নয়। কারক সম্পর্কে সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের অবলম্বিত রীতিই বাংলায় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সংস্কৃতে 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্'—ক্রিয়ার সঙ্গে যার অন্বয় বা সম্পর্ক থাকে তার নাম কারক।

বাংলায়ও এই একই সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

'ক্রিয়াপদের সহিত যে পদের কোনও অন্বয় থাকে, তাহাকে কারক (Case) বলে।' (ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ)।

কারকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডঃ সুনীতিকুমার বলেছেন, 'বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সহিত নামপদের যে সম্বন্ধ বা অন্বয় সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণে তাহাকে বলা হয় কারক'।

সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বাংলার সমস্ত বৈয়াকরণ ও ভাষাবিদ কারক অর্থে সংস্কৃত সংজ্ঞাই গ্রহণ করেছেন, এটা পরিষ্কার। সংস্কৃতে 'ষট্ কারকাণি' অর্থাৎ কারক ছ' প্রকার ঃ (১) কর্তৃকারক (২) কর্মকারক (৩) করণকারক (৪) সম্প্রদান-কারক (৫) অপাদানকারক ও (৬) অধিকরণকারক। বাংলা ব্যাকরণেও কারক এই ছ'টি। এ সম্পর্কে তেমন মতদ্বৈধ নেই। এগুলির প্রত্যেকটিই ক্রিয়ার সঙ্গে বিভিন্নভাবে অন্বিত বা সম্পর্কযুক্ত।

কিন্তু মতদ্বৈধ প্রবল হয়ে ওঠে তখনই যখন সম্বন্ধ ও সম্বোধনকে বাংলায় কারক বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়। এ সম্পর্কে বরেণ্য ভাষাবিদদের আলোচনার সারসংক্ষেপে দিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করব।

'সংস্কৃত ব্যাকরণকে আদর্শ করিয়া বাংলার ব্যাকরণ প্রায়শঃ লিখিত ও আলোচিত হয় বলিয়া, বাংলাতেও সংস্কৃতের অনুরূপ সাতটি (অথবা সম্বোধন লইয়া আটটি) কারক ধরা হয়।' (সুনীতিকুমার) অর্থাৎ সংস্কৃতের সাতটি কারক বা সম্বোধনকে সংযুক্ত করে বাংলায় মোট কারকের সংখ্যা দাঁড়ায় আটটি। প্রথমে এই মত সম্পর্কে সাধারণ বক্তব্য সারা যাক।

প্রথম কথা বলা চলে এই যে, সংস্কৃতে সাতটি কারকের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নি। পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে 'ষট্ কারকাণি' :

কর্ত্তা কর্ম্ম চ করণং সম্প্রদানং তথৈব চ।
অপদানাধিকারণ মিত্যাহুঃ কারকাণি ষট্ ॥

বাংলাতেও সাতটি বা আটটি কারক স্বীকার করা যায় না। কেন যায় না সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ সম্বন্ধে ও সম্বোধনকে পদ হিসাবে প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিয়েও উদাহরণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, '…পদটিকে কারক বলে না। কিন্তু সম্বন্ধ পদ (Possessive) বলে। বাংলায় ইহাকে সম্বন্ধ কারক বলা যাইতে পারে। …এই পদকে কারক বলা যায় না। ইহাকে সম্বোধন পদ (Vocative) বলে। বাংলায় ইহাকে সম্বোধন কারক বলা যাইতে পারে।, অর্থাৎ শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে সম্বন্ধ ও সম্বোধন যদিও 'পদ', কারক নয়, তবুও তাদেরকে কারক বলে স্বীকার করলে দোষ হয় না। এই দু'টিকে ধরলে তাই বাংলা কারকের সংখ্যা দাঁড়ায় আটটি।

কারক-বিভক্তিপ্রসঙ্গ আলোচনায় ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্তে' বলেছেন, 'বিভক্তি ধরিয়া বিচার করিলে পুরানো বাংলায় কারক প্রধানত তিনটি, (১) কর্তা-কর্ম (২) করণ-অধিকরণ এবং (৩) সম্বন্ধ। (দুই একটি গৌণ-কর্ম ও অপাদান কারকের পদ আছে। কিন্তু সেগুলি ধর্তব্য নয়।) আধুনিক বাংলায় কারক চারটি,—(১) কর্তা (২) কর্ম (৩) করণ-অধিকরণ ও (৪) সম্বন্ধ'। অর্থাৎ তাঁর মতে আর অন্য যাই হোক সম্বন্ধ প্রাচীন ও আধুনিক বাংলায় পূর্ণাঙ্গ কারকের মর্যাদাপ্রাপ্ত।

প্রথমে সম্বন্ধের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সম্বন্ধ বাংলার এই তিন প্রধান ভাষাবিদের আলোচনায় পূর্ণাঙ্গ কারকের স্থান দখল করে বসে আছে। কিন্তু যে মূল গুণ-অনুসারে আসন অধিকারের ক্ষমতা ও সুযোগ দেওয়া হয়েছে সে কি তা আদৌ পাওয়ার উপযুক্ত ? এ প্রশ্ন সঙ্গত এবং স্বাভাবিক ভাবেই তোলা যেতে পারে।

কারকের সংজ্ঞা আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি এই সমস্ত বরেণ্য ভাষাবিদরা

সংস্কৃতের 'ক্রিয়ার সঙ্গে যার অন্বয় বা সম্পর্ক আছে তার নাম কারক' এই সংজ্ঞাই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন। এই মূল সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করে দেখা যাক।

খালেদের বই; রাজার বাড়ী; জগতের বিনাশ—সম্বন্ধের এই দৃষ্টান্তগুলি শহীদুল্লাহ সাহেবের দেওয়া। অন্যদিকে সুনীতিকুমারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, রাজার রাজ্য; জলের মাছ; হাতীর দাঁত প্রভৃতি।

দৃষ্টান্তগুলির কোনটিই ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এদের সম্পর্ক বিশেষ্য পদের সঙ্গে।

খালেদের বই—এখানে খালেদের সঙ্গে বইয়ের সম্পর্কটুকুই প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ক্রিয়ার কোন প্রসঙ্গই নেই। অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলি প্রসঙ্গেও এই একই কথা। অর্থাৎ সম্বন্ধের সম্বন্ধ আর যার সঙ্গেই হোক ক্রিয়ার সঙ্গে কিছুতেই নয়। আর ক্রিয়ার সঙ্গে যার সম্বন্ধ নেই তা আর যাই হোক কারক কোনক্রমেই হ'তে পারে না।

পারেনা যে সে কথা এই সমস্ত বরেণ্য ব্যাকরণবিদরা ভালোভাবেই জানতেন। কিন্তু তবু তাঁরা মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এই মোহ ইংরেজীর মোহ। কারককে তার যথাযথ অর্থে না ধরে ইংরেজী Case-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ধরতে গিয়েই এই অকল্প পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে বলেই মনে হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে বাংলা এবং ইংরেজী দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা। একের সঙ্গে অপরের দু'একটি সাদৃশ্য থাকলেই বা দেখা গেলেই একের নিয়ম-কানুন নির্বিচারে অন্যের ওপরে চাপানো সঙ্গত বুদ্ধি বিচারের কাজ নয়। ভুলে গেলে চলবে না যে ইংরেজীর Case এবং বাংলার কারক মোটেই এক নয়।

ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কই বাংলায় কারকের মূল কথা। ক্রিয়া-সম্পর্কহীন কারক বাংলায় অসম্ভব। কিন্তু ইংরেজীতে Case আর যারই সঙ্গে সম্পর্কিত হোক ক্রিয়ার সঙ্গে কোন মতেই নয়। ইংরেজ বৈয়াকরণ Nesfieldএর মতে Case এর সংজ্ঞা হচ্ছে এই: The relation in which Noun stands to some other word, or the change of form by which the relation is indi-cated is claled, its Case.

সংক্ষেপে ইংরেজীতে Case হচ্ছে The relation of a Noun or a pronoun to other words in a sentence' অর্থাৎ এখানে বিশেষ্য-সর্বনামের সঙ্গে অন্য পদের সম্বন্ধই শুধু প্রধান নয়—একমাত্র কথা। আর বাংলা বা ইংরেজী কোন ব্যাকরণেই বিশেষ্য এবং ক্রিয়া নিশ্চয়ই এক কথা নয়।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মূল আলোচনায় সম্বন্ধকে পদহিসাবেই আলোচনা করেছেন, কারক হিসাবে নয়।

'যে পদে অন্য কোনও বিশেষ্যের বা সর্বনামের সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে সম্বন্ধ পদ বলে।'—(ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ')

'যাহার অধিকারে কোনও পদার্থ বিদ্যমান থাকে, বা যাহার সহিত কোনও পদার্থের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকে এবং উক্ত পদার্থকে যাহা বিশিষ্ট করিয়া দেয়, তাহাকে সম্বন্ধ পদীয় বা সম্বন্ধ পদ (বা ইংরেজীতে সম্বন্ধ কারক Genitive Case) বলা হয়।' (সুনীতিকুমার)

কারক সম্পর্কিত আলোচনার প্রথমেই শহীদুল্লাহ সাহেব একটি মূল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

'চারু, তুমি কি তোমার বাগান হইতে একশত ভালো আম একটি লোক দ্বারা তকীকে বর্ধমানে পাঠাইয়া দিবে ?'—এই দৃষ্টান্ত আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "পূর্বোক্ত বাক্যে 'তোমার' পদের সহিত 'দিবে' ক্রিয়ার কোনও অন্বয় নাই ; কিন্তু এই পদের সহিত বাগানের এক বিশেষ সম্বন্ধ হইয়াছে। এইজন্য 'তোমার' এই পদটিকে কারক বলে না। কিন্তু সম্বন্ধ পদ (Possessive) বলে।"—সঙ্গত যুক্তি এবং এ পর্যন্ত কোনই আপত্তি ওঠার কথা নয়। কিন্তু অব্যবহিত পরের ছত্রেই ওঠে তীব্রতম আপত্তি—'বাংলায় ইহাকে সম্বন্ধ কারক বলা যাইতে পারে।' আশ্চর্য। যা এইমাত্র এক নিশ্বাসে বলা হলো 'পদটিকে কারক বলে না কিন্তু সম্বন্ধপদ বলে' তা সেই নিশ্বাসে সেই সঙ্গেই কি করে কারকপদবাচ্য হয়ে ওঠে সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে বুঝে ওঠা দায়। ডঃ সুনীতিকুমারের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার। পৃথক পরিষ্কার আলোচনায় তিনি সম্বন্ধকে 'সম্বন্ধ পদ' বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

অথচ তাকেই সেই একই আলোচনায় কারক বলে উল্লেখ করতে তাঁর বিন্দুমাত্রও বাধে নি। ডঃ সুকুমার সেন সম্বন্ধের কোন সংজ্ঞা দেন নি তবে সম্বন্ধ তাঁর বিচারে যে পূর্ণাঙ্গ কারকের মর্যাদাপ্রাপ্ত সে তো আমরা আগেই তাঁর আলোচনায় দেখেছি।

আসলে এর জন্য সবিশেষ দায়ী ইংরেজী ব্যাকরণের প্রতি উৎকট মোহ এবং কিছুটা বেআদবি হলেও বোধহয় বলা চলে অন্ধ আনুগত্য। ইংরেজীতে সম্বন্ধ বা **Possessive** যখন **Case** তখন বাংলায় সম্বন্ধ নিশ্চয়ই কারক। যেহেতু সম্বন্ধের ইংরেজীই হচ্ছে **Possessive Case**। জানি না এই মনীষীদের যুক্তি এই রকম কিনা। আমরা শুধু এই ভেবেই আশ্চর্য হয়ে যাই যে যাকে কোন মতেই কারক বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না তা জেনে এবং মেনেও একই নিশ্বাসে কি করে কোন বিশেষ যুক্তি বুদ্ধি বিবেচনায় তাঁরা তাকে কারক বলে উল্লেখ করে থাকেন॥

এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতামত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণে, তাঁর মতে, 'সম্বন্ধ কারক হইতে পারে না, কারণ উহার সহিত ক্রিয়ার সাক্ষাৎ অন্বয় হয় না ; কিন্তু **Case** অনায়াসেই হইতে পারে, কারণ উহার কোন-না-কোন শব্দের সহিত সম্বন্ধ আছে।' কেননা 'ক্রিয়ার সহিত অন্বয় না হইলে কারক বলা যায় না ; কিন্তু ইংরেজীতে **Case**-এর লক্ষণ অন্যরূপ, নাউনের কণ্ডিশন দেখাইয়া দিলে **Case** হয়।' আমরাও এই একই কথা বলতে চাই। বলতে চাই ইংরেজীর **Case** এবং বাংলার কারক কোনমতেই এক নয়। সম্বন্ধ বাংলায় কারক নয়, হ'তে পারে না—পণ্ডিতেরা যাই বলুন এটাই আমাদের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

এর পরে আসে সম্বোধন প্রসঙ্গ। কাউকে সম্বোধন করে যখন কিছু বলা হয় তখনই হয় সম্বোধন। আর তা হয় পদ। কারক কিছুতেই নয়। কেননা সম্বোধনে ক্রিয়ার সঙ্গে কোন ধরণেরই সম্বন্ধ নেই। সম্বোধন সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন নীরব। অন্ততপক্ষে কারক-বিভক্তির মধ্যে এটিকে তিনি যে ধরেন না সেটি সুনিশ্চিত। প্রমাণ উল্লেখহীনতা। কিন্তু অন্য দু'জন বিদ্বান বৈয়াকরণ সম্বোধনকে পদ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েও ইংরেজীর মোহে পড়ে কারক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ডঃ সুনীতিকুমারের 'সম্বোধন লইয়া আটটি'তে পরিষ্কার সমর্থন রয়েছে। শহীদুল্লাহ সাহেব কারকের মূল দৃষ্টান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পূর্বোক্ত (চারু, তুমি কি.....ইত্যাদি) বাক্যটিতে চারুকে সম্বোধন করিয়া বা ডাকিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু 'চারু' এই পদের সহিত 'দিবে' ক্রিয়াপদের কোনও অন্বয় নাই। এইজন্য 'চারু' এই পদকে কারক বলা যায় না; ইহাকে সম্বোধন পদ (Vocative) বলে।' সঙ্গত যুক্তি। কিন্তু ঠিক পরের ছত্রেই 'বাংলায় ইহাকে সম্বোধন কারক বলা যাইতে পারে।'—আশ্চর্য। একে যে কি বলা যাবে বুঝে ওঠা দায়। এটি আলোচনার সময় ইংরেজীর Vocative Case বা Case of Address নিশ্চয়ই সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

শুধু ওপরের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত উদ্ধৃত ছত্রগুলিতেই নয়, অন্যত্র পৃথক আলোচনায় শহীদুল্লাহ সাহেব 'সম্বোধন পদ' শীর্ষক আলোচনাই করেছেন—সম্বোধন কারকের নয়। সংজ্ঞা দিয়েছেন সম্বোধন পদের, কারকের নয়। বলেছেন, 'যাহাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলা যায় তাহাকে সম্বোধন পদ বলে।'

ডঃ সুনীতিকুমার তাঁর 'ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ'এর সরল (সর্বশেষ) সংস্করণে এই সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছেন, 'কাহাকেও সম্বোধন করিতে যে বিশেষ্য পদ ব্যবহৃত হয়, ব্যাকরণে তাহাকে বলে সম্বোধন পদ। বাক্যস্থিত ক্রিয়া পদের সহিত এই সম্বোধন পদের সাক্ষাৎ অন্বয় থাকে না, এই হেতু সম্বোধন পদকেও কারক-পদ বলা চলে না।' আসল অসঙ্গতি রয়ে গেছে এই সমস্ত বৈয়াকরণদের নিজেদের মধ্যেই। তাই তাঁদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখিয়েই তাঁদের ভাষায় বলব সম্বোধনকে কোনক্রমেই কারক বলা যায় না 'ইহাকে সম্বোধন পদ বলে'।

মূল আলোচনা আর না বাড়িয়ে এখানেই পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই যে, বাংলায় কারক ছ'টি। সম্বন্ধ ও সম্বোধন, পণ্ডিতেরা যাই বলুন, বাংলায় কারক হ'তে পারে না।

লক্ষণীয় যে শহীদুল্লাহ সাহেব কারকের সংজ্ঞা-আলোচনার নীচেই একটি ছোট্ট 'টীকা' সংযোজন করে আদালতের পরিভাষায় Benefit of Doubt বা সন্দেহের সুযোগে সম্বোধন ও সম্বন্ধকে কারকের পর্যায়ে ঠেলতে চেয়েছেন। প্রয়োগটি খুবই

সতর্ক কিন্তু খুবই আপত্তিজনক। টীকায় তিনি বলেছেন, 'ক্রিয়াপদ বা বাক্যের সহিত যে পদের কোনও অন্বয় থাকে, তাহাকে কারক বলে। এই সংজ্ঞা দ্বারা সম্বন্ধও সম্বোধন কারক হইতে পারে'।

যদি ভুল না বুঝে থাকি, এবং ভুল না বোঝার চেষ্টা হয় তাহলে বলব এই সতর্ক প্রয়োগের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম এবং প্রধান আপত্তি ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যের 'অথবা' সংযোজনে। ক্রিয়াপদ পূর্ণাঙ্গ বাক্যের একটি অংশমাত্র, পূর্ণবাক্য নয়। দ্বিতীয়তঃ এর ফলে কারকের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব যে ক্রিয়াপদের তাকে অনেকখানি লঘু করে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। আর এই সুযোগেই সম্বন্ধ ও সম্বোধনকে কারকের পর্যায়ে উন্নীত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। টীকার 'এই সংজ্ঞা দ্বারা' কথাটির ব্যবহার এ ব্যাপারে খুবই সুস্পষ্ট। কেননা, একথা আমরাও কিছুতে অস্বীকার করতে পারিনা যে বাক্যের সহিত সম্বন্ধ ও সম্বোধনের এক প্রকার অন্বয় অবশ্যই আছে।

সে যা-ই হোক এই ছ'টি কারকের অস্তিত্ব বাংলা ব্যাকরণে সাধারণভাবে স্বীকৃত এ সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও কথা উঠেছে এই ছ'টির মধ্যে দু'টির সম্পর্কে। একটি বহুদিনের বিতর্কিত সম্প্রদান কারকের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকারের ঔচিত্য। দ্বিতীয়টি ডঃ সুকুমার সেনের কাছ থেকে ইঙ্গিতে পাওয়া গেল, সেটি অপাদান কারক সম্পর্কিত। প্রাচীন-মধ্য এবং আধুনিক এই দুই যুগের কারক বিভক্তি সম্পর্কিত আলোচনায় অপাদান কারকের কথা তিনি উল্লেখই করেননি। বন্ধনীর মধ্যে 'ধর্তব্য নয়' বলেই কর্তব্য সেরেছেন। কিন্তু প্রশ্ন করা যেতে পারে, অপাদান কারকের অস্তিত্ব কি এতই ফেলনা, এতই তুচ্ছ, অবহেলাযোগ্য? যদি আদতে অবহেলাযোগ্যই হয়ে থাকে তাহলে কেন, কি কারণে হয়েছে? এ সম্পর্কে কোনও আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে ডঃ সেন মনে করেন নি। কিন্তু শুধু প্রয়োজন নয় যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলেই আমরা মনে করি। কোন কিছুকে গ্রহণ করা বা বর্জন করা যাই করা হোক না কেন, তার পিছনে উপযুক্ত, অপরিহার্য বিজ্ঞানসম্মত কারণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। অপাদান কারকের বাংলায় কোন প্রয়োজন নেই, এমন কথা এর আগে কেউ বলেন নি। তাই কারণটাও পরিষ্কার বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। এক হ'তে পারে এই যে—অপাদান কারক চিহ্নিত হয়ে থাকে প্রধানত অনুসর্গ বা কারক-অব্যয় দ্বারা; কোন বিশেষ বিভক্তিচিহ্ন দ্বারা নয়।

যদি তাই-ই হয়ে থাকে তাহ'লে তার জবাবে বলা যেতে পারে অনেক কিছু। বলা যেতে পারে অনুসর্গ বা কারক-অব্যয় যোগে কারক নিষ্পন্ন হয় শুধু অপাদানেই নয়, হয় কর্মে, করণে, সম্প্রদাণে, অধিকরণে সর্বত্রই। যা নিয়ে অনেকেই কাজ চালায়, তার জন্য বিশেষ একজনকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়াটা সঙ্গত বিচারবুদ্ধির কাজ নিশ্চয়ই নয়, উপরন্তু পক্ষপাতিত্ব ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের প্রবল অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও সর্বাধিক।

আসলে বাংলায় কারক চিহ্নিতকরণের পথ দুটি: (১) বিভক্তি যোগ ও (২) কারক অব্যয় বা অনুসর্গ যোগ। ষষ্ঠীর বিশিষ্ট বিভক্তি চিহ্ন 'র' 'এর' ছাড়া বাংলায় বিভক্তি মাত্র চারটি: এ,কে,রে,তে। এগুলি কোন কারকের একচেটিয়া নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এর মধ্যে 'এ'র ব্যবহার সর্বঘটে, কারকে-অকারকে। বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই 'এ' বিভক্তি দিয়ে এক অদ্ভুত উদাহরণ খাড়া করে ছিলেন:

গ্রামে সবে একমনে পূজিয়ে দেবতাগণে
খড়্গে ছাগে কাটে লোকহিতে॥

এখানে 'গ্রামে' অধিকরণে সপ্তমী; 'সবে' কর্তায় প্রথমা, 'একমনে'; (ক্রিয়া বিশেষণ জাতীয় অকারক) তৃতীয়া, মতান্তরে করণে তৃতীয়া; 'দেবতাগণে' কর্মে দ্বিতীয়া; 'খড়্গে' করণে তৃতীয়া; 'ছাগে' কর্মে দ্বিতীয়া; 'লোকহিতে' নিমিত্তার্থে চতুর্থী। এমন কি অসমাপিকা ক্রিয়া 'পূজিয়ে' ও সমাপিকা ক্রিয়া 'কাটে' সবই এ-কারান্ত। একমাত্র পঞ্চমীটিই এই উদাহরণে বাদ গিয়েছে। কিন্তু পঞ্চমীতেও এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়:

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা।

এখানে বিপদে=বিপদ হইতে, অপাদানে পঞ্চমী। 'তে' প্রথমা, সপ্তমী এবং অন্যান্য কারকেও হয়। 'কে' 'রে' সম্পর্কেও একই কথা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সুতরাং বাংলায় যেখানে চার পাঁচটি ছাড়া মূল বিভক্তিচিহ্নই নেই, অনুসর্গ বা কারক অব্যয় দিয়েই কারকের কাজ চালাতে হয় সেখানে অনুসর্গযোগে অপাদান কারকের সৃষ্টি বলে তাকে বাতিল করে দেওয়া আর যাই হোক বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধির অভ্রান্ত রায় নিশ্চয়ই নয়। অন্য আর একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে বাংলা বাগ্-বিধিতে অপাদানের অতি অল্প ব্যবহার। এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে

বাংলায় অপাদানের ব্যবহার অপ্রচুর নয়। নিত্যকার কথাবার্তায় অপাদানের উপাদান যথেষ্টই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত উল্লেখ বাহুল্য বলেই বোধহয়। তাই অপাদান কারককে 'ধর্তব্য নয়' বলে কর্তব্য সারাটা বৈজ্ঞানিক বিচারনিষ্ঠ বৈয়াকরণের দায়িত্ব নয় বলেই মনে হয়।

এরপর আসে সম্প্রদান কারক প্রসঙ্গ। অনেকে 'কেবল এক দান-ক্রিয়ার জন্য' সম্প্রদান কারকের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকারে সম্মত নন। তাঁদের বক্তব্য এই যে কর্ম এবং সম্প্রদানের বিভক্তি এবং উদ্দেশ্য লক্ষ্য যখন এক, তখন একে আর পৃথক কোন কারক বলে স্বীকার করে লাভ কি? তাই তাঁরা একে কর্মকারকেরই অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে থাকেন।

'একমাত্র দানক্রিয়ার জন্য বাংলায় একটা পৃথক কারক খাড়া করা উচিত কিনা' সে বিচার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পণ্ডিতদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডঃ সুনীতিকুমার রায় দিয়েছেন, 'বস্তুতঃ বাংলাতে সম্প্রদান কারককে কর্মকারকের অন্তর্গত করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই এবং তাহাই সমীচীন' ব'লে। কিন্তু শুধু সমীচীন বলে ছেড়ে দিলেই হয় না, তার পিছনের অপরিহার্য যুক্তিগুলিও তুলে ধরতে হয়।

'বাংলা ভাষার ব্যাকরণে সর্বত্রই সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা আছে, একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না।' এবং সুনীতিকুমারের মতো আমরাও তা বলি না। কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত যুক্তি থাকাও প্রয়োজন নয় কি?

এই প্রসঙ্গ আলোচনায় সুনীতিকুমার বলেছেন, 'বাংলায় গৌণকর্ম ও সংস্কৃতের সম্প্রদান কারকের মধ্যে অর্থতঃ কোন পার্থক্য নাই··· গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারক এই দুইটিকে পৃথক করিয়া ধরিবার বিশেষ সার্থকতা বাংলায় নাই।' কিন্তু আমাদের মতে এ দুটির মধ্যে 'অর্থতঃ' সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান। আর এই পার্থক্যের জন্যই দু'টিকে পৃথক করে ধরবার বিশেষ সার্থকতা বাংলায় আছে। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার কর্ম দু'টির মধ্যেএকটি বস্তু ও অন্যটি ব্যক্তি। ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এই বস্তুকে অবলম্বন করে তাই বস্তুই প্রধান বা মুখ্য কর্ম এবং পাত্র বা ব্যক্তি অপ্রধান বা গৌণ। কিন্তু সম্প্রদান কারকে পাত্রটিই প্রধান বা মুখ্য অবলম্বন—দেয় বস্তু অপ্রধান বা গৌন।

আর কোন বিচারেই পাত্র বা ব্যক্তি এবং বস্তু নিশ্চয়ই এক নয়। 'সে আমাকে একটি বই'—দিল দৃষ্টান্তটিতে 'দিল' এই দ্বিকর্মক ক্রিয়াটি সম্পাদিত হচ্ছে 'বই'কে মুখ্য বা প্রধান ভাবে অবলম্বন করে। এখানে 'কাকে দিল'র চেয়ে বড়ো হচ্ছে 'কি দিল' সেই প্রশ্নটা। কিন্তু, 'দরিদ্রকে ভিক্ষা দাও' এখানে বড়ো হচ্ছে 'কি দেওয়া হবে' সে প্রশ্ন নয়, বড়ো হচ্ছে 'কাকে দেওয়া হবে' সেই প্রশ্ন। তাই গৌণকর্ম এবং সম্প্রদান 'অর্থতঃ' এক নয়, সুস্পষ্টভাবেই আলাদা। তাছাড়া বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে কর্ম কারকে যে দেওয়া বোঝায় সে দেওয়া স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছায় দেওয়া নয়, সে দেওয়া ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে দেওয়া। কোন ত্যাগের মহান আদর্শ, কোন স্বেচ্ছাব্রত উদ্‌যাপনের মহৎ দৃষ্টান্ত, কোন পবিত্র উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে দেওয়ার সদিচ্ছা সেখানে নেই। 'ধোপাকে কাপড় দাও'—এখানে 'ধোপাকে' কর্মকারক। কাপড় দেওয়া হচ্ছে আবার ফেরৎ পাওয়ার জন্য। কিন্তু 'ভিখারীকে ভিক্ষা দাও' সম্প্রদান কারক। 'ভিখারীকে' যে ভিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, একটা পবিত্র ত্যাগের ব্রতে, একটা মাহাত্ম্যবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, স্বত্ব-স্বামিত্ব সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে। দুটিই দুটিই দেওয়া 'কে' বিভক্তিযুক্ত কারক দৃষ্টান্ত; কিন্তু দুটির মধ্যে উদ্দেশ্য ও প্রয়োগগত পার্থক্য পরিষ্কার। শুধু তাইনয়, কর্মকারকে বিভক্তি লোপ হ'তে পারে, কিন্তু সম্প্রদানের বিভক্তি কখনই লোপ হয় না। একই বিভক্তির ব্যবহার প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য অপাদানের আলোচনায় বলেছি। পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র। এই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার-বিবেচনা করে আমরা বাংলায় সম্প্রদান কারকের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করবার পক্ষপাতী। কারক-প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত খুবই সুস্পষ্ট—কারক ছ, প্রকার। সম্বন্ধ ও সম্বোধন কারক নয়, পদ মাত্র। আর ক্রিয়া-সম্বন্ধই কারকত্ব। ৩ ॥

বাংলা ব্যাকরণের আর একটি জটিল প্রসঙ্গ—উপসর্গবিচার। এখানেও সংস্কৃতের সংজ্ঞাই গ্রহণ করা হয়েছে।

'প্র, পরা, প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ (?) ধাতুর পূর্বে বসিয়া একই ধাতুর নানা-বিধ অর্থ প্রকাশ করে, ইহাদিগকে উপসর্গ (Prefix) বলে।' (ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ)।

'সংস্কৃতে কতকগুলি 'অব্যয়' আছে যেগুলি ধাতুর পূর্বে যুক্ত হইয়া ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, কিম্বা বিশিষ্টতা দান করে, ধাতুর নূতন অর্থের সৃষ্টি করে। সংস্কৃত

ব্যাকরণে ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত এইরূপ 'অব্যয়'কে বলা হইয়াছে উপসর্গ।' (ডঃ সুনীতি-কুমার)।

অর্থাৎ ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে যে সমস্ত অব্যয় ধাতুর নূতন নূতন অর্থের সৃষ্টি করে তাদের নাম উপসর্গ। এই সূত্র অনুসারে উপসর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে, অথচ আদিতে অব্যয়, এমন অব্যয় সংখ্যায় (প্র, পরা, নির প্রভৃতি) কুড়িটি। দৃষ্টান্ত দেখা যাক। 'হৃ'ধাতুর আদি অর্থ হরণ করা। প্র, আ, বি, সম, পরি প্রভৃতি অব্যয় যোগে গঠিত হয়—প্রহার, আহার, বিহার, সংহার, পরিহার প্রভৃতি রূপ। কিন্তু কোন-টিতেই হৃ-ধাতুর আদি অর্থ বজায় নেই। সর্বত্রই এই অব্যয় সংযোগের ফলে অর্থের রূপান্তর ঘটেছে। এই জন্য এই অব্যয়গুলি এখানে আর নিছক অব্যয়ই থাকেনি, উপসর্গের মর্যাদা পেয়েছে।

ক্রিয়াযোগেই উপসর্গের সার্থকতা। অর্থাৎ কেবল মাত্র ধাতুর পূর্বে যুক্ত হলেই এই অব্যয়গুলি উপসর্গ নাম প্রাপ্ত হয়। ধাতুর পূর্বে যুক্ত না হলে এগুলি নিছক অব্যয়ই থেকে যায়। 'আহার' শব্দের 'আ' এবং 'আসমুদ্র' শব্দের 'আ' উভয়ই মূলত অব্যয়, কিন্তু দু'টির প্রয়োগের মধ্যেই পার্থক্য পরিষ্কার। 'আহার' শব্দের 'আ' অব্যয়, কিন্তু 'হৃ'-ধাতুর পূর্বে যুক্ত হওয়াতে উপসর্গবাচ্য। কিন্তু 'আসমুদ্র' শব্দের 'আ' নিছকই অব্যয়, উপসর্গ নয়। কেননা এটি কোন ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয় হয়েছে 'সমুদ্র' শব্দের পূর্বে। ঠিক এমনি ভাবে 'প্রহার' শব্দের 'প্র' উপসর্গ, কিন্তু 'প্রপিতামহ' শব্দের 'প্র' নিছকই অব্যয়।

উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থ পরিবর্তিত ও বিশেষিত হয় বলে একই ধাতুর উত্তর পৃথক পৃথক উপসর্গযোগে ভিন্নার্থক বা বিশিষ্টার্থক পৃথক পৃথক শব্দ গঠন করা যেতে পারে। অর্থাৎ উপসর্গের ভূমিকাধাতুর অর্থান্তর বা অর্থবৈশিষ্ট হচ্ছে সাধনের দ্বারা নূতন শব্দ গঠন।

উপসর্গের এ পর্যন্ত আলোচনায় আমাদের কোনই আপত্তি নেই। আপত্তি ওঠে তখনই যখন এই একই সংজ্ঞা ধরে এর মধ্যে পড়েনা এমন সমস্ত আলোচনাকে জোর করে এর মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে উপসর্গকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সংস্কৃত উপসর্গ ও বাংলা উপসর্গ। এই সম্প্রদায়ের মুখ্যাচার্য ডঃ সুনীতিকুমারের

এ-সম্পর্কিত সর্বশেষ মতামত (মার্চ, ১৯৬৫) সবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক : 'বাংলা শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত বহু অসংস্কৃত শব্দে কতকগুলি অব্যয় বা অব্যয়রূপী শব্দকে সংস্কৃতের উপসর্গের মতো, শব্দের পুরোভাগে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃতের উপসর্গ ধাতুর পূর্বে যুক্ত হইয়া ধাতুর অর্থকে পরিবর্তিত বা বিশেষিত করে ; কিন্তু এই অব্যয়গুলি সংস্কৃতের উপসর্গের মতো ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয় না—এই অব্যয়গুলি সার্থক শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়। এগুলিকে বাংলা উপসর্গ বলা হইয়াছে।

বাংলাতে উপসর্গ দ্বিবিধ : 'সংস্কৃত উপসর্গ' ও 'বাংলা উপসর্গ'। 'সংস্কৃত উপসর্গ সংস্কৃত শব্দে মেলে এবং ইহা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হইয়া ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। 'বাংলা উপসর্গ' মেলে বাংলা শব্দে, ইহা শব্দের পূর্বে যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ গঠন করে। 'সংস্কৃত উপসর্গ' ও 'বাংলা উপসর্গ' উভয়ই 'নূতন শব্দ তৈরি করবার বেলায়' ব্যবহৃত হয়।'

আলোচনাটি পড়লেই তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কতকগুলি প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়--'উপসর্গের মতো', 'উপসর্গ নয়', 'উপসর্গের ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয় না'। যদি এগুলি আদৌ উপসর্গবাচ্য না হয়, উপসর্গের নিজস্ব গঠনভঙ্গী ও প্রয়োগবৈশিষ্ট্য এদের না থাকে, তবে উপসর্গ বলা যেতে পারে কোন বিশেষ কারণে—তা অবশ্য আলোচনা থেকে অনুমান করাও অসম্ভব।

আমাদের বক্তব্য যদি উপসর্গের সংজ্ঞা সংস্কৃত মতেরই গ্রহণ করা হয়, আর সেই অনুযায়ী বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ ছাড়া যদি উপসর্গের দৃষ্টান্ত না মেলে, তাহলে উপসর্গের তকমা পরিয়ে, তার জন্য নির্ধারিত আসন ছেড়ে দিয়ে অজাতকে জাতে তোলার প্রচেষ্টা কেন ? আর এই ভাবে এই অকারণ জটিলতাবৃদ্ধির শুভ সঙ্কল্প ও সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করা কেন ? আমরা বলেছি এবং বাংলার সমস্ত বৈয়াকরণই বলে থাকেন—কেবলমাত্র ধাতুর পূর্বে যুক্ত হলেই এই অব্যয়গুলি (প্র, পরা, প্রভৃতি উপসর্গ) নামধেয় হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। না হ'লে নিছক অব্যয়ই থেকে যায়। অথচ তথাকথিত বাংলা-উপসর্গে এই বিশেষ স্বরূপ লক্ষণটি সম্পূর্ণ ভাবেই অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, এই তথাকথিত অব্যয়গুলিকেও আসলে অব্যয় বলা চলে কিনা তাও বিচার্য বিষয়।

বাংলায় শব্দসৃষ্টির সাহায্যকারী এই জাতীয় তথাকথিত অব্যয় বা প্রায়-অব্যয়গুলির ব্যবহৃত রূপকে একটি ভিন্ন নামেই অভিহিত করা উচিত। তাছাড়া এই উপায়ে সৃষ্ট শব্দগুলিকেও তো বাংলায় উপযুক্ত যুক্তিসহ অন্যভাবে উৎপত্তি-নির্দেশ বা গঠনভঙ্গী বর্ণনা করা চলে। তথাকথিত বাংলা উপসর্গের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে—অনামুখো, নিখোঁজ, ভর-সাঁঝ, সবুট, সজোরে, গরহাজির, হররোজ, বদমেজাজী প্রভৃতি শব্দের। এগুলি তো সমস্তই সমাসের উদাহরণ। অনামুখো—বহুব্রীহি ; নিখোঁজ—বহুব্রীহি ; ভরসাঁঝ—কর্মধারয় ; সবুট—তুল্যযোগে বহুব্রীহি ; সজোরে—তুল্যযোগে বহুব্রীহি ; গরহাজির—নঞ্ তৎপুরুষ; হররোজ—অব্যয়ীভাব ; বদমেজাজী—বহুব্রীহি।

অঘোরে, পাতিহাঁস, পাতিলেবু, পাতকুয়ো, হাঘরে, হাভাতে, এগুলিকেও উপ-সর্গের দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করা যায় না। বড়জোর অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর পরিভাষায় বলা যেতে পারে—প্রাকসংসর্গ অব্যয়।

ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাংলা ব্যাকরণ'-এ বাংলা উপসর্গগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনাই করেন নি, কারণ দেখানো তো দূরের কথা। কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই দায় সেরেছেন। তবে, 'অ' (নঞ্) এবং 'কু'কে উপসর্গ হিসাবে ধরা হয়নি বলে তিনি কিছুটা উষ্মাভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁর আলোচনার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু তুলে ধরছিঃ 'দ্রষ্টব্য। 'অ' (নঞ্) এবং 'কু' এই দুইটি উপসর্গ মধ্যে পরিগণিত না হইলেও বাংলা ব্যাকরণে ইহাদিগকে উপসর্গ বলিয়া গণ্য করা উচিত। 'সুসময়' এইস্থানে যদি 'সু' উপসর্গ হয় তবে 'অসময়' এবং 'কুসময়' এই দুই শব্দে 'অ' 'কু' কেন উপসর্গ হইবে না।'

এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি এই দুটি উপসর্গ হিসাবে আদৌ পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন না করে থাকে, তাহ'লে উপসর্গ বলে তাদের গণ্য করতে হবে কেন? কোন বিশেষ কারণে? তাছাড়া 'অ' এবং 'কু'—এই দুটিই তো তথাকথিত বাংলা উপসর্গে নিত্যস্বীকৃত ও ব্যবহৃত। ডঃ সুনীতি-কুমার তাঁর ব্যাকরণে এ দুটিকেই সানন্দ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

তবে শহীদুল্লাহ সাহেব প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যও বলে রাখা ভালো যে 'সুসময়', 'অসময়' অথবা 'কুসময়' যে সময়ই এখন আমাদের এসে থাকুক, এই তিনটির কোনটিকেই আমরা উপসর্গের দৃষ্টান্ত হিসাবে স্বীকার করে নিতে রাজী নই। আমাদের মতে, 'সুসময়' এবং 'কুসময়' দু'টিই কর্মধারয় এবং 'অসময়' নঞ্ তৎপুরুষ সমাসেরই দৃষ্টান্ত।

উপসর্গ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট: সংস্কৃত উপসর্গের সংজ্ঞা স্বীকার করে (সমস্ত বৈয়াকরণই যখন তা করেন, করে থাকেন) তথাকথিত বাংলা উপসর্গ নামক 'আজব চীজ'কে আমরা কোন মতেই স্বীকৃতি দিতে রাজী নেই। স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থই ধাতু এবং শব্দকে এক করে ফেলা, সেটা পণ্ডিতবুদ্ধির কাজ হতে পারে কিন্তু সুবুদ্ধির পরিচয় নয় বলেই আমরা মনে করি। আমাদের মতে, বাংলায় সংস্কৃত বিচার-রীতিতে সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দে উপসর্গ নেই থাকতে পারে না। ব্যাকরণে 'বাংলা উপসর্গ'কে আমরা সম্পূর্ণ ভাবে পরিহার করবার পক্ষপাতী।৪॥

বাংলা ব্যাকরণ পঠনপাঠন প্রসঙ্গে কয়েকটি সমস্যার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। সেগুলি যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে ব্যাকরণরসিক শিক্ষিত সুজন সাধারণের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম। আশা করি, এব্যাপারে তাঁরাও গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। বাংলা ব্যাকরণ : ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ (১৩৭৩ সং)
২। ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ক.বি. ১৯৩৯)
৩। সরল ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ —(মার্চ—১৯৬৫)
৪। সরল বাঙলা ব্যাকরণ—শ্যামাপদ চক্রবর্তী (১৯৬৩)
৫। English Grammar Series Book IV—J.C. Nesfield. M.A: পাণিনিপ্রসঙ্গ শ্যামাপদ চক্রবর্তীর 'সরল বাঙলা ব্যাকরণ' থেকে নেওয়া।